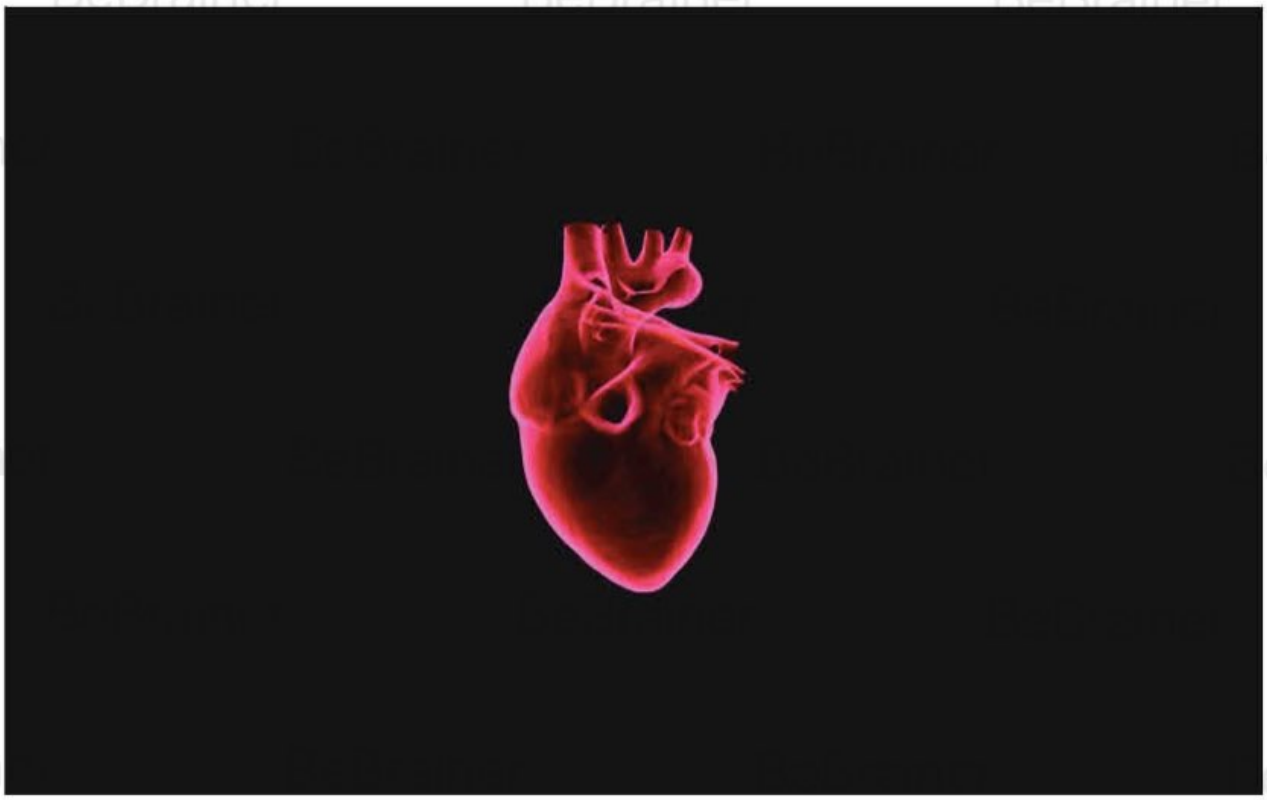
তৃতীয় অধ্যায়

হৃদ্‌যন্ত্রের যত কথা



মানুষ ও অন্যান্য উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের দেহে যেসব তন্ত্র আছে, তার মধ্যে রক্ত সংবহনতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই তন্ত্রের মাধ্যমে দেহের যাবতীয় বিপাকীয় কাজের রসদ সারা শরীরে পরিবাহিত হয়। রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত হয়েছে রক্ত, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকা নিয়ে। হৃৎপিণ্ড হচ্ছে হৃৎপেশি দিয়ে তৈরি ত্রিকোণাকার ফাঁপা প্রকোষ্ঠযুক্ত পাম্পের মতো একটি অঙ্গ। এর সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে সারা দেহে রক্ত সরবরাহিত হয়। আকার, আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা তিন রকম— ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা। রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড মানব ও অন্য সকল প্রাণীদেহে পাম্পের মতো কাজ করে। ধমনি দিয়ে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয়। সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। ধমনি ও শিরার সংযোগস্থল জালিকাকারে বিন্যস্ত হয়ে কৈশিক জালিকা গঠন করে। আমরা এ অধ্যায়ে রক্ত এবং রক্ত সঞ্চালনের যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারব।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

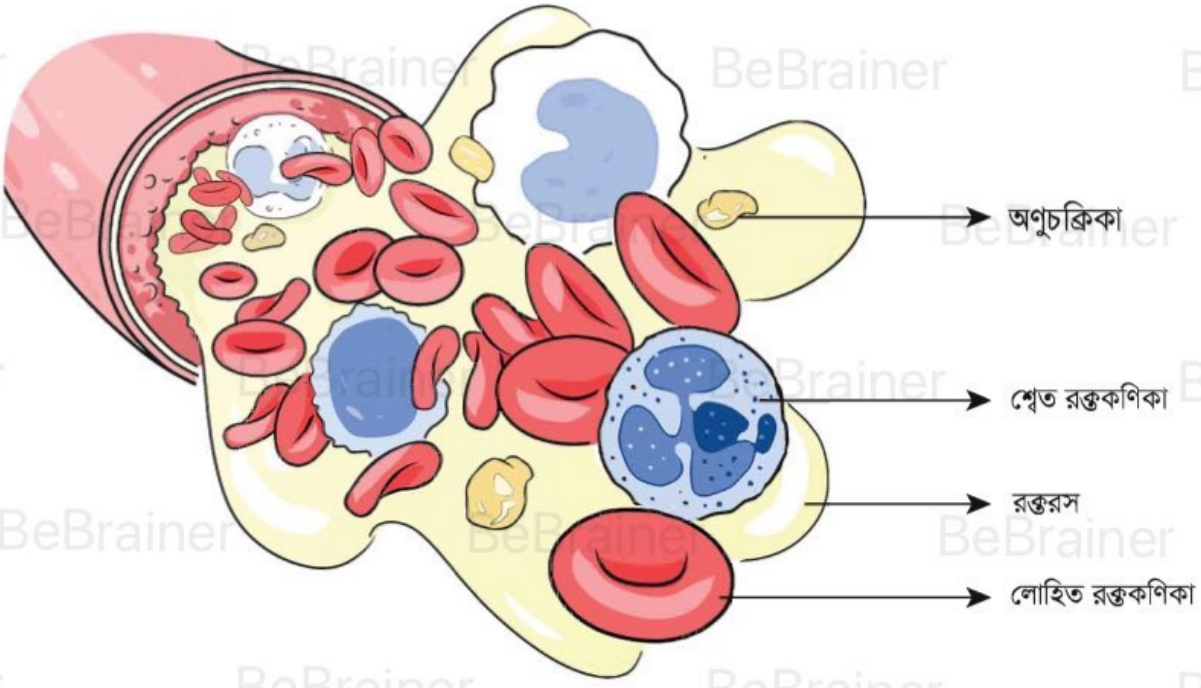
- রক্তের উপাদান এবং এদের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তের স্থানান্তরের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তে বিঘ্নতা/বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ এবং এর ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শরীরে রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আদর্শ রক্তচাপ, হার্টবিট, হার্টরেট এবং পালসরেটের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্তচাপজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ ও প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শরীরে রক্ত সঞ্চালনে কোলেস্টেরলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কোলেস্টেরলকে প্রত্যাশিত সীমায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তে সুগারের ভারসাম্যতার কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃদ্‌যন্ত্রকে ভালো রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারব।

৩.১ রক্ত (Blood)

প্রাণীদেহের রক্ত একধরনের লাল বর্ণের অস্বচ্ছ, আন্তঃকোষীয় লবণাক্ত এবং খানিকটা ক্ষারধর্মী তরল যোজক টিস্যু। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে, যেটি মানুষের দেহের মোট ওজনের প্রায় ৮%। মানুষ এবং অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহের রক্ত লাল রঙের। রক্তের রসে লাল রংয়ের হিমোগ্লোবিন নামে লৌহ-ঘটিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকায় রক্তের রং লাল। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে অক্সিজেন পরিবহন করে। কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়, তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সিংহভাগ বাইকার্বনেট আয়ন হিসেবে রক্ত দ্বারা ফুসফুসে পরিবাহিত হয়।

রক্তের উপাদান ও এদের কাজ:

রক্তের প্রধান উপাদানগুলো হলো রক্তরস বা প্লাজমা এবং রক্তকণিকা (চিত্র ৩.০১)। সমগ্র রক্তের ৫৫% রক্তরস এবং বাকি ৪৫% রক্তকণিকা রক্তরসকে আলাদা করলে এটি হলুদ বর্ণের দেখায় এবং রক্তকণিকাগুলো এই রক্তরসে ভাসমান থাকে।



চিত্র ৩.০১: মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদান

৩.১.১ রক্তরস বা প্লাজমা

রক্তের তরল অংশকে প্লাজমা বলে। রক্তরসের প্রায় ৯০% পানি, বাকি ১০% দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বিভিন্ন রকমের জৈব এবং অজৈব পদার্থ। অজৈব পদার্থগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থের আয়ন, যেমন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আয়োডিন এবং O_2, CO_2 এবং N_2 জাতীয় গ্যাসীয় পদার্থ। জৈব পদার্থগুলো হলো:

১. খাদ্যসার: গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি।

২. রেচন পদার্থ: ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি।

৩. প্রোটিন: ফাইব্রিনোজেন, গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন, প্রোথ্রম্বিন ইত্যাদি।

৪. প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি: অ্যান্টিটক্সিন, অ্যাগ্লুটিনিন ইত্যাদি।

৫. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোন।

৬. কোলেস্টেরল, লেসিথিন, বিলিরুবিন ইত্যাদি নানা ধরনের যৌগ।

রক্তরসের কাজগুলো হচ্ছে:

১. রক্তকণিকাসহ রক্তরসে দ্রবীভূত খাদ্যসার দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত করা।

২. টিস্যু থেকে বর্জ্য পদার্থ নির্গত করে, সেগুলো রেচনের জন্য বৃক্কে পরিবহন করা।

৩. শ্বসনের ফলে কোষের সৃষ্ট CO_2 কে বাইকার্বনেট হিসেবে ফুসফুসে পরিবহন করা।

৪. রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করা।

৫. হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করা।

৬. রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা।

সিরাম:

রক্ত থেকে রক্তকণিকা এবং রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যে প্রয়োজনীয় প্রোটিন আছে, সেটাকে সরিয়ে নেওয়ার পর যে তরলটি রয়ে যায়, তাকে সিরাম বলে। অন্যভাবে বলা যায়, রক্ত জমাট বাঁধার পর যে হালকা হলুদ রংয়ের স্বচ্ছ রস পাওয়া যায়, তাকে সিরাম বলে। রক্তরস বা প্লাজমা এবং সিরামের মাঝে পার্থক্য হলো রক্তরসে রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকে, সিরামে সেটি থাকে না।

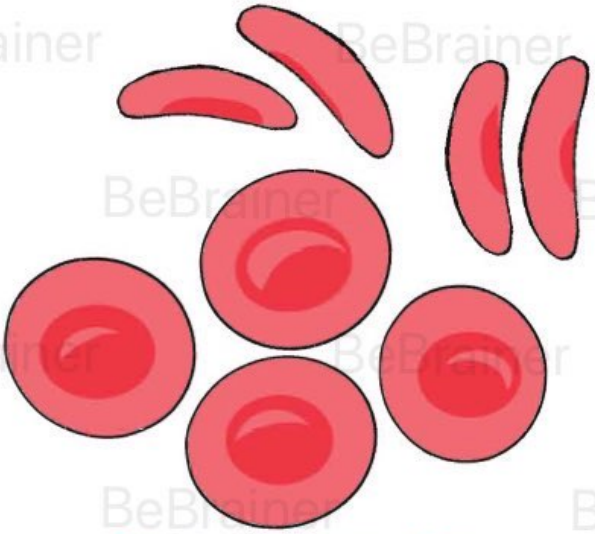
৩.১.২ রক্তকণিকা

রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন রকমের কোষকে রক্তকণিকা বলে। রক্তকণিকাগুলো প্রধানত তিন রকমের, যথা:

(ক) লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট
(খ) শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট এবং
(গ) অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট।

লোহিত রক্তকণিকা

মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা দ্বি-অবতল এবং চাকতি আকৃতির (চিত্র ৩.০২)। এতে হিমোগ্লোবিন নামে রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে দেখতে লাল বর্ণের হয়। এজন্য এদেরকে Red Blood Cell বা RBC বলে। অন্যভাবে বলা যায়, লোহিত কণিকা প্রকৃতপক্ষে হিমোগ্লোবিন ভর্তি চ্যাপ্টা আকৃতির ভাসমান ব্যাগ। এ কারণে লোহিত কণিকা অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করতে পারে। লোহিত কণিকাগুলোর বিভাজন হয় না। এ কণিকাগুলো সর্বক্ষণই অস্থিমজ্জার ভিতরে উৎপন্ন হতে থাকে এবং উৎপন্ন হওয়ার পর রক্তরসে চলে আসে। মানুষের লোহিত কণিকার আয়ু প্রায় চার মাস অর্থাৎ ১২০ দিন। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকাগুলো উৎপন্ন হওয়ার পর রক্তরসে আসার পূর্বে নিউক্লিয়াসবিহীন হয়ে যায়। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না অর্থাৎ এদের লোহিত কণিকাগুলোতে নিউক্লিয়াস থাকে। লোহিত কণিকা প্লীহা (Spleen) তে সঞ্চিত থাকে এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে প্লীহা থেকে লোহিত কণিকা রক্তরসে সরবরাহ হয়।



চিত্র ৩.০২: লোহিত রক্ত কণিকা

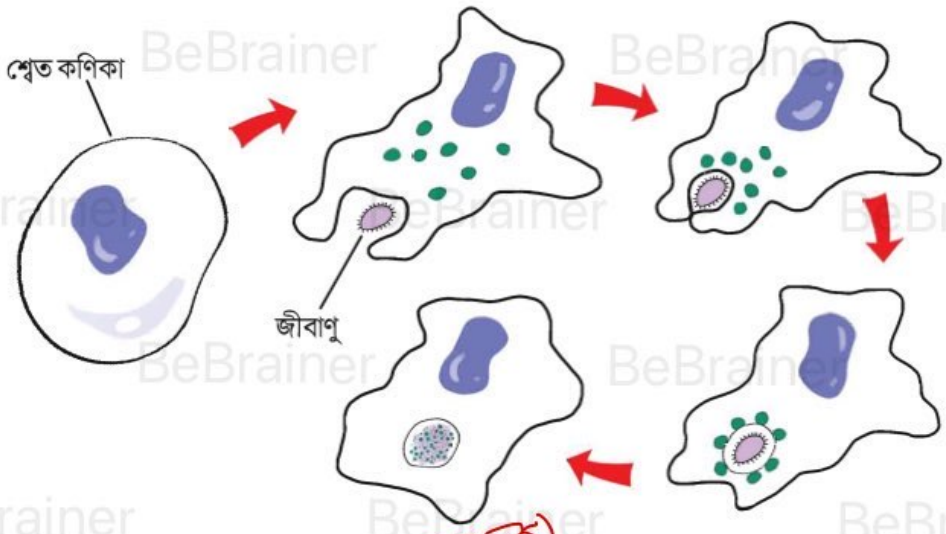
বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে গড়ে লোহিত কণিকার সংখ্যা ভিন্ন। যেমন ভ্রূণ দেহে: ৮০-৯০ লাখ; শিশুর দেহে: ৬০-৭০ লাখ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষ দেহে: ৪.৫-৫.৫ লাখ এবং পূর্ণবয়স্ক নারীর দেহে: ৪.০-৫.০ লাখ।

লোহিত কণিকার কাজ

লোহিত রক্তকণিকার প্রধান কাজ হলো:

১. দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করা।
২. নিষ্কাশনের জন্য কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে টিস্যু থেকে ফুসফুসে বহন করা।
৩. হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে রক্তের অম্ল-ক্ষারের সমতা বজায় রাখার জন্য বাফার হিসেবে কাজ করা।

২০১৮



চিত্র ৩.০৩: শ্বেত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করছে।

শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট

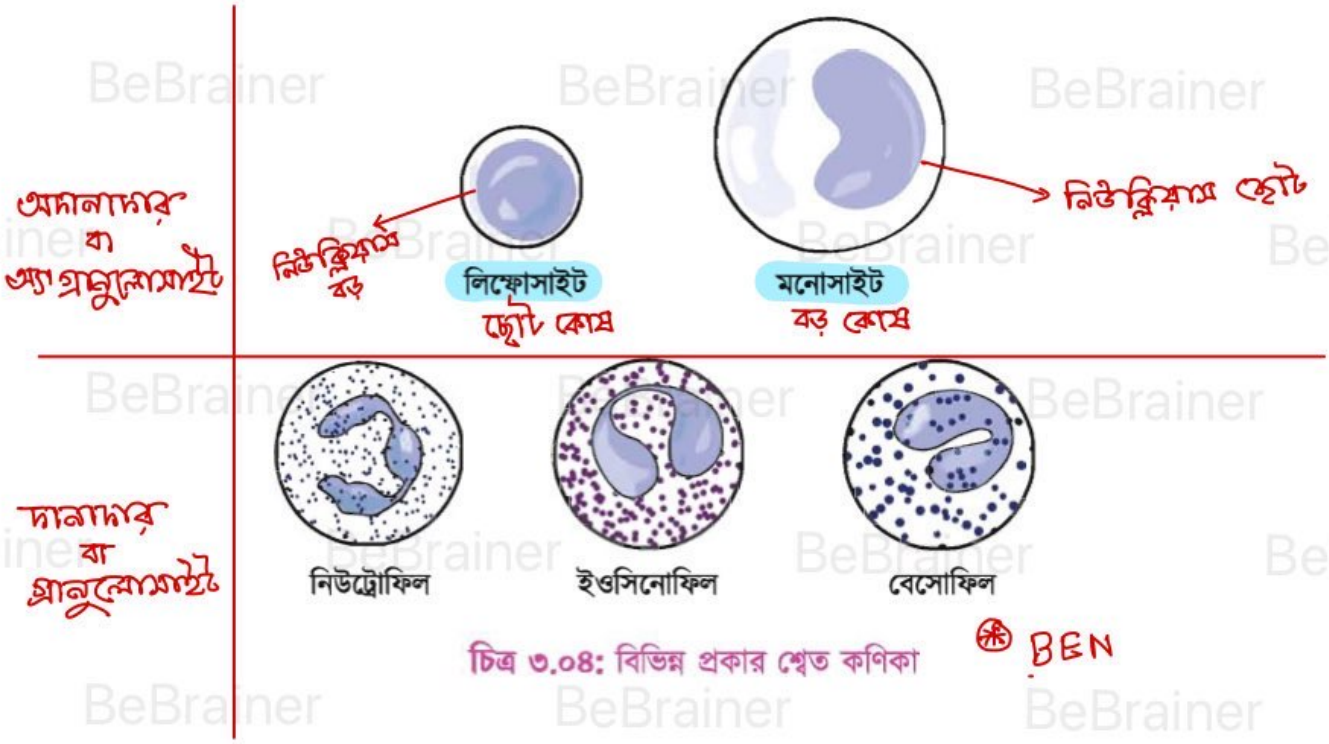
শ্বেত কণিকার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এগুলো হিমোগ্লোবিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় আকারের কোষ। শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ১-১৫ দিন। হিমোগ্লোবিন না থাকার কারণে এদের শ্বেত রক্তকণিকা, ইংরেজিতে White Blood Cell বা WBC বলে। শ্বেত কণিকার সংখ্যা RBC-এর তুলনায় অনেক কম। এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় (চিত্র ৩.০৩) এটি জীবাণুকে ধ্বংস করে। শ্বেত কণিকাগুলো রক্তরসের মধ্য দিয়ে নিজেরাই চলতে পারে। রক্ত জালিকার প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। দেহ বাইরের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে দ্রুত শ্বেত কণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে ৪-১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অসুস্থ মানবদেহে এর সংখ্যা বেড়ে যায়। শ্বেত রক্ত কণিকায় DNA থাকে।

প্রকারভেদ: গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে শ্বেত কণিকাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ৩.০৪), যথা (ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট বা দানাবিহীন এবং (খ) গ্রানুলোসাইট বা দানাযুক্ত।

(ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট

এ ধরনের শ্বেত কণিকাগুলোর সাইটোপ্লাজম দানাহীন ও স্বচ্ছ। অ্যাগ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকা দুই রকমের; যথা-লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। দেহের লিম্ফনোড, টনসিল, প্লীহা ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়। লিম্ফোসাইটগুলো বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত ছোট কণিকা। মনোসাইট ছোট, ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট বড় কণিকা। লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে এবং এই অ্যান্টিবডির দ্বারা দেহে

প্রবেশ করা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে। এভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে।



চিত্র ৩.০৪: বিভিন্ন প্রকার শ্বেত কণিকা

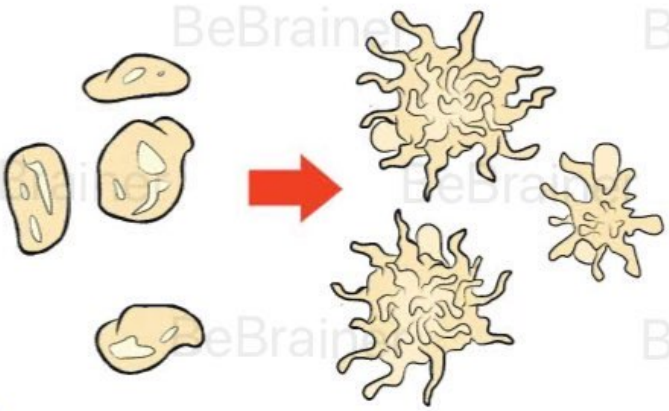
(খ) গ্রানুলোসাইট

এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাযুক্ত। গ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকাগুলো নিউক্লিয়াসের আকৃতির ভিত্তিতে তিন প্রকার যথা: নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল।

নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবাণু ভক্ষণ করে। ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে। বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতরে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট

ইংরেজিতে এদেরকে প্লেইটলেট (Platelet) বলে। এগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা রড আকারের হতে পারে। এদের ① সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং সাইটোপ্লাজমে কোষ অঙ্গাণু- ② মাইটোকন্ড্রিয়া, ③ গলগি বস্তু থাকে; কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেকের মতে, অণুচক্রিকাগুলো সম্পূর্ণ



চিত্র ৩.০৫: অণুচক্রিকা এবং তার আকার পরিবর্তন

২০১৮

কোষ নয়; এগুলো অস্থিমজ্জার বৃহদাকার কোষের ছিন্ন অংশ। অণুচক্রিকাগুলোর গড় আয়ু ৫-১০ দিন। পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। অসুস্থ দেহে এদের সংখ্যা আরো বেশি হয়।

অণুচক্রিকার প্রধান কাজ হলো রক্ত তঞ্চন করা বা জমাট বাঁধানোতে (blood clotting) সাহায্য করা। যখন কোনো রক্তবাহিকা বা কোনো টিস্যু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কেটে যায়, তখন সেখানকার অণুচক্রিকাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে অনিয়মিত আকার ধারণ করে (চিত্র ৩.০৫) এবং থ্রম্বোপ্লাসটিন (Thromboplastin) নামক পদার্থ তৈরি করে। এ পদার্থগুলো রক্তের প্রোটিন প্রোথ্রমবিনকে থ্রমবিনে পরিণত করে। থ্রমবিন পরবর্তী কালে রক্তরসের প্রোটিন- ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন জালকে পরিণত করে রক্তকে জমাট বাধায় কিংবা রক্তের তঞ্চন ঘটায়। ফাইব্রিন একধরনের অদ্রবণীয় প্রোটিন, যা দ্রুত সুতার মতো জালিকা প্রস্তুত করে। এটি ক্ষত স্থানে জমাট বাঁধে এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। তবে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি আরও জটিল, এ প্রক্রিয়ার জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এবং ভিটামিন K ও ক্যালসিয়াম আয়ন জড়িত থাকে।

একক কাজ

কাজ: লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অণুচক্রিকার মধ্যে পার্থক্যগুলো ছকে লিখ।

৩.১.৩ রক্তের সাধারণ কাজ

১. শ্বাসকার্য: রক্ত অক্সিজেনকে ফুসফুস থেকে টিস্যু কোষে এবং টিস্যু কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ফুসফুসে পরিবহন করে। লোহিত কণিকা ও রক্তরস প্রধানত এ কাজটি করে।

২. হরমোন পরিবহন: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে।

৩. খাদ্যসার পরিবহন: দেহের সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে এবং পরিপাককৃত খাদ্যসার দেহের টিস্যু কোষগুলোতে বহন করে।

৪. বর্জ্য পরিবহন: নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলোকে কিডনি বা বৃক্কে পরিবহন করে।

৫. উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ: দেহে তাপের বিস্তৃতি ঘটিয়ে দেহের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. রোগ প্রতিরোধ: দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে মনোসাইট ও নিউট্রোফিল জাতীয় শ্বেত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণুকে গ্রাস করে ধ্বংস করে। লিম্ফোসাইট-জাতীয় শ্বেত কণিকা অ্যান্টিবডি গঠন করে দেহের ভিতরের জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং বাইরের থেকে জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করে।

প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক মান:

১. লোহিত রক্তকণিকা: (পুরুষ) প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪.৫-৫.৫ লাখ
(নারী) প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪-৫ লাখ

২. শ্বেত কণিকা: প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪০০০-১০,০০০

(i) নিউট্রোফিল: ৪০-৭৫%
(ii) ইওসিনোফিল: ১-৬%
(iii) মনোসাইট: ২-১০%
(iv) লিম্ফোসাইট: ২০-৪৫%
(v) বেসোফিল: ০-১%

সর্বমোট স্বাভাবিক WBC এর মানের শতকরা হার।

৩. হিমোগ্লোবিন
পুরুষ: ১৪-৪৬ g/dl
নারী: ১২-১৪ g/dl

৪. অণুচক্রিকা: ১ প্রতি ঘনমিলিমিটার ৫০,০০০-৪,০০,০০০

অন্যান্য জৈব পদার্থ :

(i) সিরাম ইউরিয়া: ১৫-৪০ mg/dl
(ii) সিরাম ক্রিয়েটিনিন: ০.৫-১.৫ mg/dl
(iii) কোলেস্টেরল: ০-২০০ mg/dl
(iv) বিলিরুবিন: ০.২-১.০ mg/dl
(v) রক্ত শর্করা (আহারের পূর্বে) স্বাভাবিক সীমা: ৪-৬ mMol/l

(l = ডেসিলিটার)

৩.১.৪ রক্ত উপাদানের অস্বাভাবিক অবস্থা

মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য ঘটলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা বলা হয়। যেমন:

১. **পলিসাইথিমিয়া:** লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়া।

২. **অ্যানিমিয়া:** লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যাওয়া অথবা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কমে যাওয়া।

৩. লিউকেমিয়া: নিউমোনিয়া, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি শ্বেত কণিকার সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে ৫০,০০০-১,০০০,০০০ হয়, তাহলে তাকে লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার বলে।

৪. লিউকোসাইটোসিস: শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থার মান থেকে বেড়ে যদি ২০,০০০-৩০,০০০ হয়, তাকে লিউকোসাইটোসিস বলে। নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি ইত্যাদি রোগে এ অবস্থা হয়।

৫. থ্রম্বোসাইটোসিস: এ অবস্থায় অণুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়াকে থ্রম্বোসিস বলে। হৃৎপিণ্ডের করোনারি রক্তনালির রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে করোনারি থম্বোসিস এবং গুরু মস্তিষ্কের রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বলে।

৬. পারপুরা: ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে এ অবস্থা হতে পারে। এ অবস্থায় অণুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়।

৭. থ্যালাসেমিয়া: থ্যালাসেমিয়া একধরনের বংশগত রক্তের রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়। হিমোগ্লোবিনের অস্বাভাবিকতার কারণে লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যায়, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। এ রোগটি মানুষের অটোজোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা ঘটে। যখন মাতা ও পিতা উভয়ের অটোজোমে এ জিনটি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তখন তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন জিন দুটি একত্রিত হয়ে এই রোগের প্রকাশ ঘটায়। সাধারণত শিশু অবস্থায় থ্যালাসেমিয়া রোগটি শনাক্ত হয়। এ রোগের জন্য রোগীকে প্রতি ৩ মাস অন্তর রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তশূন্যতার হার কমে যায়।

৩.২ রক্তের গ্রুপ

৩.২.১ অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি

একজনের রক্তের সাথে আরেকজনের রক্ত মেশানো হলে কেন সেটি কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবে মিশে যায় আবার কেন কখনো কখনো গুচ্ছবদ্ধ হয়ে যায় সেটি বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের দুটি বিষয় বুঝতে হবে, একটি হচ্ছে অ্যান্টিজেন, অন্যটি হচ্ছে অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেন হচ্ছে বহিরাগত কোনো বস্তু বা প্রোটিন, যেটি আমাদের রক্তে প্রবেশ করলে আমাদের শরীরের নিরাপত্তাব্যবস্থা (Immune System) সেটাকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর মনে করে তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। অ্যান্টিজেনকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের রক্ত যে পদার্থ তৈরি করে, সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেন এবং তাকে

প্রতিরোধ করার জন্য সৃষ্ট অ্যান্টিবডি যখন একই দ্রবণে থাকে, তখন একটি বিশেষ ধরনের বিক্রিয়া ঘটে। অ্যান্টিজেনকে আক্রমণ করার এই বিক্রিয়াকে অ্যান্টিবডি-অ্যান্টিজেন বিক্রিয়া বলা যায় এবং রক্তের মাঝে এই বিক্রিয়ার কারণে রক্ত কণিকাগুলো গুচ্ছবদ্ধ হয়ে যায়।

১৯০০ সালে ড. কার্ল ল্যান্টস্টেইনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন, বিভিন্ন মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় দুই ধরনের অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই দুইটি অ্যান্টিজেনকে প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন মানুষের সিরামে (যে তরলে লোহিত কণিকা ভাসমান থাকে) দুটি অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়। লোহিত কণিকায় থাকা এই দুটি অ্যান্টিজেনকে A এবং B নাম দেওয়া হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ একজন মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় যদি A অ্যান্টিজেন থাকে তাহলে কোনোভাবেই তার রক্তে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি থাকতে পারবে না- যদি থাকে তাহলে এই অ্যান্টিবডি নিজেই নিজের রক্তের লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে মৃত্যুর কারণ হয়ে যাবে। A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি না থাকলেও, B অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি থাকে। একইভাবে যে রক্তের লোহিত কণিকায় B অ্যান্টিজেন আছে সেখানে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি আছে।

অ্যান্টিজেন এবং তার অ্যান্টিবডির বিষয়টি বুঝে থাকলে আমরা মানুষের রক্ত কীভাবে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে সেটি বুঝতে পারব।

যদি লোহিত রক্ত কণিকায় A এবং B এই দুটি অ্যান্টিজেন থাকা সম্ভব হয় তাহলে আমরা রক্তকে নিচের চারভাগে ভাগ করতে পারি:

গ্রুপ A	রক্তে অ্যান্টিজেন A	সিরামে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি নেই। B অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি আছে।
গ্রুপ B	রক্তে অ্যান্টিজেন B	সিরামে B অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি নেই, শুধু A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি আছে।
গ্রুপ AB	রক্তে অ্যান্টিজেন A এবং B দুটোই আছে।	সিরামে A কিংবা B কারো অ্যান্টিবডি নেই থাকা সম্ভব নয়।
গ্রুপ O	রক্তে A কিংবা B কোনো অ্যান্টিজেন নেই।	সিরামে A এবং B দুটো অ্যান্টিজেনেরই অ্যান্টিবডি আছে।

এখন তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে কোন মানুষের কোন গ্রুপের রক্ত দেওয়া সম্ভব।

O গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকায় যেহেতু কোনো অ্যান্টিজেনই নেই তাকে যেকোনো গ্রুপেই দেওয়া সম্ভব। সেই গ্রুপে যে অ্যান্টিবডিই থাকুক, কোনো ক্ষতি করা সম্ভব নয়। এজন্য O গ্রুপকে বলা হয়

ইউনিভার্সাল ডোনার।

আবার অন্যদিকে AB গ্রুপের রক্ত, নিজের গ্রুপ ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপকে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ অন্য সব গ্রুপেই কোনো না কোনো অ্যান্টিবডি আছে এবং AB গ্রুপ দুটো অ্যান্টিজেনই থাকার কারণে যে কোনো একটি বা দুটি অ্যান্টিবডিই লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে গুচ্ছবদ্ধ করে দেয়।

A গ্রুপ এবং B গ্রুপের রক্ত নিজের গ্রুপ ছাড়া শুধু AB গ্রুপকে দেওয়া যেতে পারে, কারণ AB গ্রুপে কোনো অ্যান্টিবডি নেই, তাই A কিংবা B অ্যান্টিজেনকে আক্রান্ত করতে পারবে না।

আবার আমরা যদি গ্রহীতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে উল্টোটা দেখতে পাব। O গ্রুপ কারো রক্তই নিতে পারবে না, কারণ অন্য কোনো গ্রুপের সিরামে দুই ধরনের অ্যান্টিবডিই আছে। অন্যদিকে AB গ্রুপ সবার রক্তই নিতে পারবে কারণ তার সিরামে কোনো ধরনের অ্যান্টিবডিই নেই। এজন্য AB কে বলা হয় Universal Acceptor.

দাতা

গ্রহীতা / গ্রুপ	O-	O+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
AB+	●	●	●	●	●	●	●	●
AB-	●		●		●		●	
A+	●	●			●	●		
A-	●				●			
B+	●	●	●	●				
B-	●		●					
O+	●	●						
O-	●							

চিত্র ৩.০৬: কোন গ্রুপের রক্ত কাকে দেওয়া যাবে।

৩.২.২ Rh ফ্যাক্টর

এতক্ষণ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে, সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ এখন পর্যন্ত রক্তের গ্রুপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজনের কথা বলা হয়নি। তোমরা যারা রক্ত গ্রুপের সাথে পরিচিত, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, রক্তের গ্রুপ বোঝানোর সময় শুধু A, B, AB কিংবা O বলা হয় না, সবসময়েই এর পর একটি প্লাস বা মাইনাস যুক্ত করা হয় (যেমন A+, O- ইত্যাদি)। এই প্লাস বা মাইনাস চিহ্নটি কোথা থেকে আসে?

রেসাস নামের বানরের লোহিত রক্তকণিকায় এক ধরনের অ্যান্টিজেন রয়েছে যেটি অনেক মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় পাওয়া যায়। এই বানরের নাম অনুসারে এটাকে Rhesus Factor বা সংক্ষেপে Rh ফ্যাক্টর বলে। যাদের শরীরে এই অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়, তাদের রক্তকে Rh+ এবং যাদের শরীরে এটি নেই, তাদের রক্তকে Rh- বলা হয়। রক্তের গ্রুপের পিছনে যে প্লাস এবং মাইনাস চিহ্নটি থাকে, সেটি এই Rh ফ্যাক্টর ছাড়া অন্য কিছু নয়।

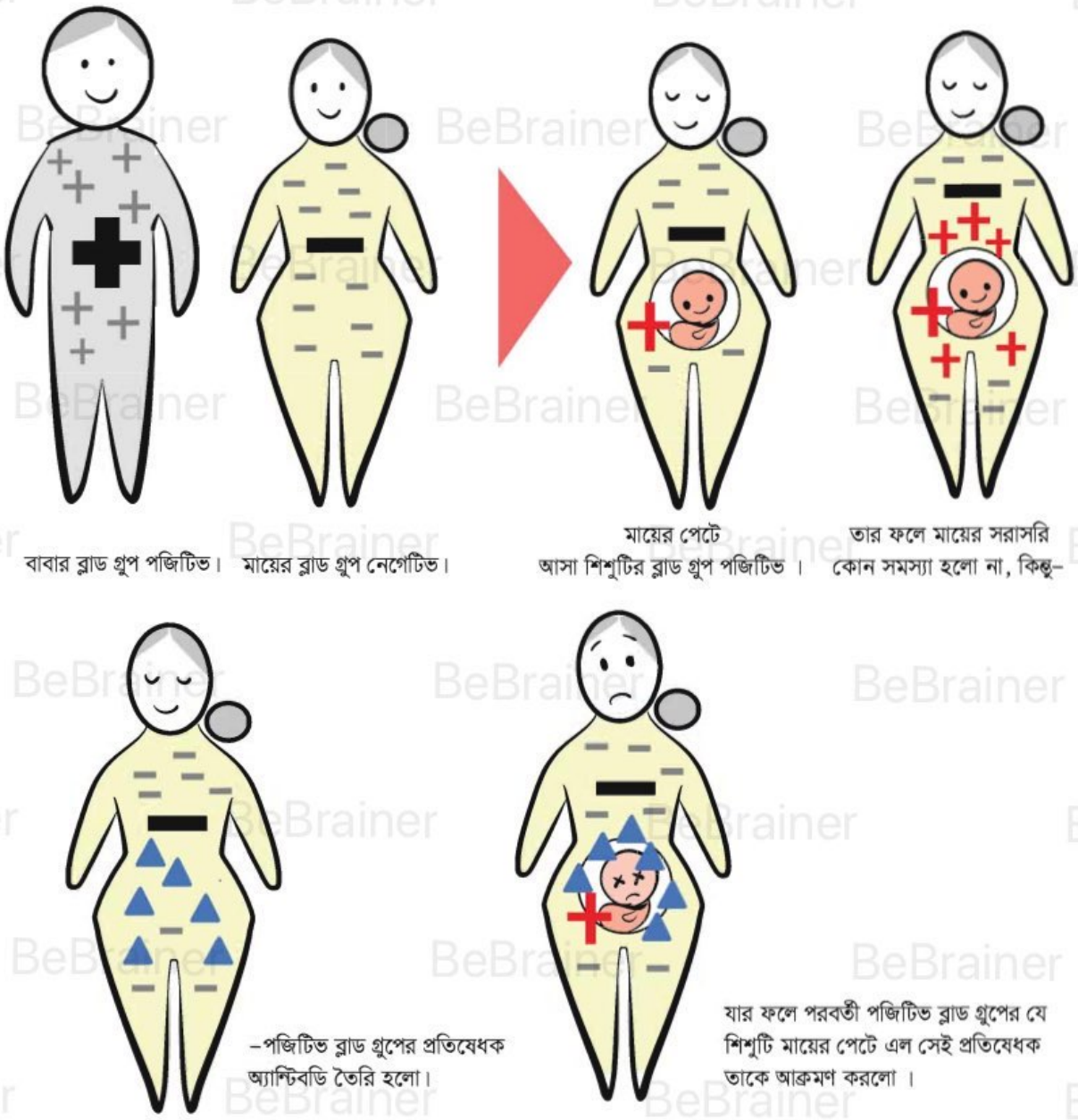
তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ Rh- রক্ত সবসময়ই Rh+ বিশিষ্ট রক্তের মানুষকে দেওয়া সম্ভব (চিত্র ৩.০৬) কিন্তু উল্টোটা এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে । Rh- রক্তবিশিষ্ট মানুষকে Rh+ বিশিষ্ট রক্ত দিয়ে প্রথমবার গ্রহীতার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রহীতার রক্ত রসে Rh+ অ্যান্টিজেনের বিপরীত অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। কাজেই দ্বিতীয়বার Rh+ বিশিষ্ট রক্ত দেওয়া হলে এই অ্যান্টিবডি Rh+ রক্তের লোহিত কণিকার সাথে বিক্রিয়া করে রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেবে। তবে একবার Rh+ বিশিষ্ট রক্ত গ্রহণ করার পর যদি গ্রহীতা আর ঐ রক্ত গ্রহণ না করে তাহলে ধীরে ধীরে তার শরীরের Rh+ এর অ্যান্টিবডি নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রহীতা তার স্বাভাবিক রক্ত ফিরে পায়।

সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য এই Rh ফ্যাক্টরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি মায়ের রক্ত Rh- এবং বাবার রক্ত Rh+ হয় তাহলে তাদের সন্তান হবে Rh+ বিশিষ্ট, কারণ Rh+ একটি 'প্রকট' বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ এটি Dominate করে)। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ প্ল্যাসেন্টা বা 'অমরা'-এর মাধ্যমে মায়ের জরায়ুর সাথে যুক্ত থাকে। সন্তানের Rh+ রক্ত প্ল্যাসেন্টার মাধ্যমে মায়ের রক্তে পৌঁছাবে এবং মায়ের রক্তরসে Rh+ এর বিপরীত অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। যেহেতু এই অ্যান্টিবডি খুব ধীরে ধীরে তৈরি হয়, তাই প্রথম সন্তানের বেলায় মায়ের রক্তের Rh+ এর অ্যান্টিবডি সন্তানের দেহে পৌঁছে তার রক্তের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং একজন সুস্থ সন্তান জন্ম নেয় (চিত্র ৩.০৭)।

তবে দ্বিতীয় সন্তান গর্ভধারণ করার পর মায়ের শরীরের Rh+ এর অ্যান্টিবডি সন্তানের রক্তে প্রবেশ করতে থাকে এবং ভ্রূণের লোহিত কণিকা ধ্বংস করে, ভ্রূণ বিনষ্ট হয়, অনেক সময় গর্ভপাত হয়। সন্তান জীবিত জন্ম নিলেও তার প্রচন্ড রক্তস্বল্পতা থাকে এবং জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা দেয়।

এজন্য বিয়ের আগেই হবু বর-কনের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

২০১৮



চিত্র ৩.০৭: মায়ের রক্ত Rh- এবং বাবার রক্ত Rh+ হলে সন্তানের জটিলতা হতে পারে।

একক কাজ

কাজ: কোন গ্রুপের রক্ত কোন গ্রুপ নিতে পারবে, সেই তথ্য ব্যবহার করে পরের ছকে গ্রহীতার গ্রুপ বের কর।

		দাতা							
গ্রহীতা	Type	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-
		√	√					√	√
				√	√				√
									√
			√		√		√		√
		√	√	√	√	√	√	√	√
								√	√
			√						√
									√

৩.২.৩ রক্তের শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব

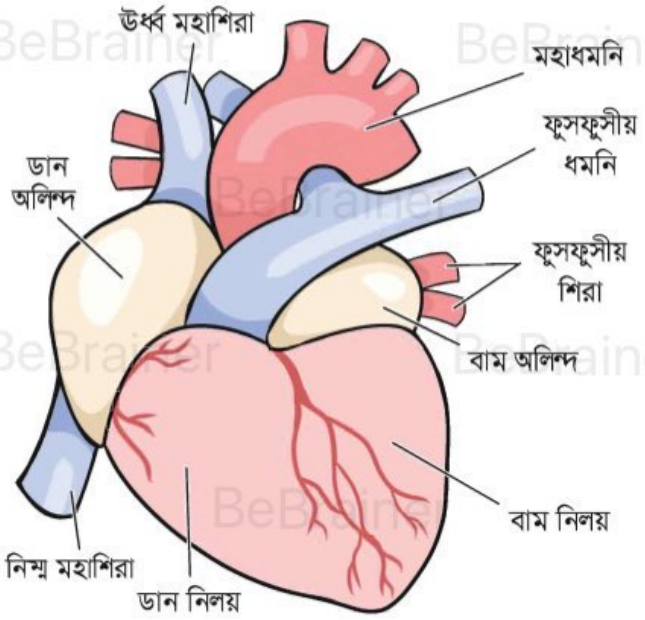
১. কোনো দাতার রক্ত গ্রহীতার দেহে দেওয়ার আগে সবসময়েই দুজনের রক্তের গ্রুপ জানার জন্য পরীক্ষা করে নেওয়া খুব জরুরি। ভুল গ্রুপের রক্ত দেওয়া হলে গ্রহীতার রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে প্রাণহানির কারণ হতে পারে। খুবই জরুরি অবস্থায় যদি গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ জানা সম্ভব না হয়, তাহলে O এবং Rh নেগেটিভ রক্ত দেয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

২. কোনো শিশুর পিতৃত্ব নির্ণয়ে জটিলতা দেখা দিলে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে অনেক সময় তার সমাধান করা যায়।

৩. রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অপরাধীদের শণাক্তকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

রক্ত নীতি

মানুষের অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত রক্তের ঘাটতি দেখা দিলে অন্য মানুষের শরীর থেকে রক্ত দেওয়ার বা রক্ত সঞ্চারণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত এবং সঠিক গ্রুপের রক্ত নিশ্চিত করে নিতে হয়। রক্ত সঞ্চারণের আগে রক্তে এইডস, জন্ডিস— এধরনের জটিল রোগের জীবাণু আছে কি না তাও পরীক্ষা করে নিতে হয়। ডাক্তার অবশ্য রোগী ও দাতার রক্তে A, B, O ও Rh ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করে গ্রুপ ম্যাচ করার মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে রক্ত সঞ্চারনের উদ্যোগ নেন। সঠিকভাবে গ্রুপ ম্যাচ না করে রক্ত সঞ্চারণ করা হলে মানুষের শরীরে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে।



চিত্র ৩.০৮: হৃৎপিণ্ড

৩.৩ রক্ত সঞ্চালন

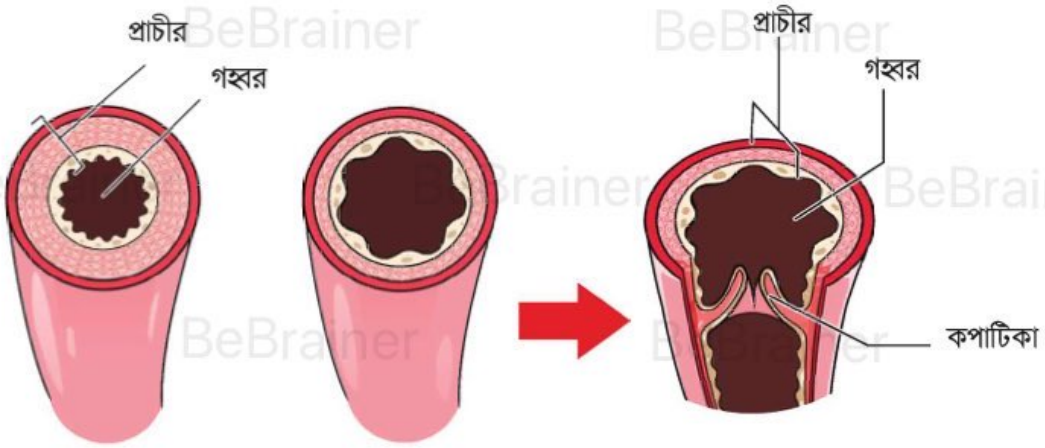
এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা জেনেছি যে রক্তসংবহনতন্ত্রের দ্বারা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে রক্ত সঞ্চালন হয়। মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অংশগুলো হলো: হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা এবং কৈশিক জালিকা। এগুলোর কাজ সম্পর্কে জানার আগে এগুলোর গঠন সম্পর্কে জানা দরকার, তাই প্রথমে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

৩.৩.১ হৃৎপিণ্ড (Heart)

হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের অন্তর্গত একরকমের পাম্প। হৃৎপিণ্ড অনবরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়।

মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরে ফুসফুস দুটির মাঝখানে এবং মধ্যচ্ছদার ওপরে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের প্রশস্ত প্রান্তটি ওপরের দিকে এবং ছুঁচালো প্রান্তটি নিচের দিকে বিন্যস্ত থাকে (চিত্র: ৩.০৮)।

হৃৎপিণ্ডটি দ্বিস্তরী পেরিকার্ডিয়াম পর্দা দিয়ে বেষ্টিত থাকে। উভয় স্তরের মাঝে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড থাকে, যেটি হৃৎপিণ্ডকে সংকোচনে সাহায্য করে। মানুষের হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। ওপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান এবং বাম অলিন্দ (Atrium) এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান ও বাম নিলয় (Ventricles) বলে। দুটি অলিন্দের ভেতরকার প্রাচীর পাতলা কিন্তু নিলয় দুটির প্রাচীর পুরু এবং পেশিবহুল। ডান অলিন্দের সঙ্গে একটি ঊর্ধ্ব মহাশিরা এবং একটি নিম্ন মহাশিরা যুক্ত থাকে।



চিত্র ৩.০৯: ধমনি এবং শিরার প্রস্থচ্ছেদ

বাম নিলয়ের সঙ্গে চারটি পালমোনারি শিরা যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনি এবং বাম নিলয় থেকে মহাধমনি উৎপত্তি হয়েছে।

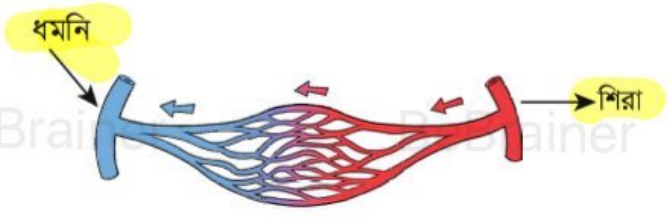
ধমনি

যেসব রক্তনালির মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়, তাকে ধমনি বা আর্টারি বলে। ধমনির প্রাচীর পুরু এবং তিনটি স্তরে গঠিত। এদের গহ্বর ছোট (চিত্র ৩.০৯)। ধমনিতে কোনো কপাটিকা থাকে না। ফলে ধমনি দিয়ে রক্ত বেগে প্রবাহিত হয়।

ধমনির স্পন্দন আছে। ধমনি শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং এদের শাখা ধমনি এবং অ্যার্টেরিওল বলে। এগুলো ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয়। তবে ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম, এই রক্তনালি দিয়ে হৃৎপিণ্ড ফুসফুসে রক্ত প্রেরণ করে বলে এটিকে ধমনি (Pulmonary Artery) বলা হলেও এটি কার্বন ডাই-অক্সাইড-যুক্ত রক্ত পরিবহন করে।

শিরা

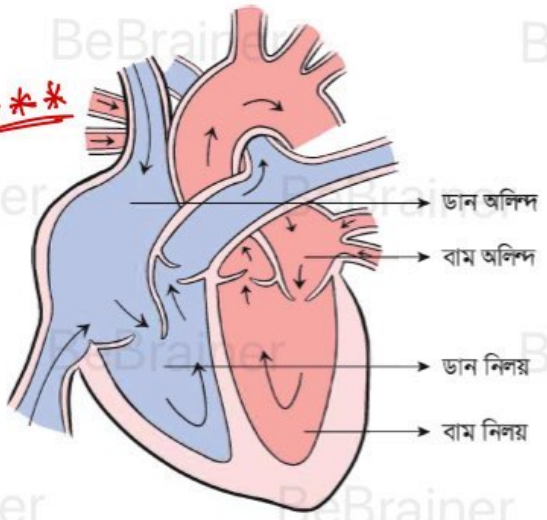
যেসব রক্তনালির মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড-পূর্ণ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে, তাদের শিরা বলে। তবে পালমোনারি শিরা এর ব্যতিক্রম। এর মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে বলে এটিকে শিরা বলা হয়। তবে এই শিরা ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত



চিত্র ৩.১০: কৈশিক জালিকা

হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা এবং গহ্বরটি বড় (চিত্র ৩.০৯)। শিরায় কপাটিকা থাকায় শিরা দিয়ে রক্ত ধীরে ধীরে একমুখে প্রবাহিত হয়।

ধমনি প্রান্তের কৌশিক জালিকাগুলো ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শিরা বা উপশিরা গঠন করে। উপশিরাগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে পরে শিরা গঠন করে। কতগুলো শিরা মিলে মহাশিরা গঠন করে। এভাবে শিরা কৈশিক জালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়।



চিত্র ৩.১১: হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

কৈশিক জালিকা

ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে অবস্থিত কেবল এক স্তরবিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়াম দিয়ে গঠিত যেসব সূক্ষ্ম রক্তনালি জালকের আকারে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে কৈশিক জালিকা বলে (চিত্র ৩.১০)। কৈশিক জালিকার রক্ত ও কোষের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা পুষ্টিদ্রব্য, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, রেচন পদার্থ ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে।

৩.৩.২ হৃৎপিণ্ডের কাজ

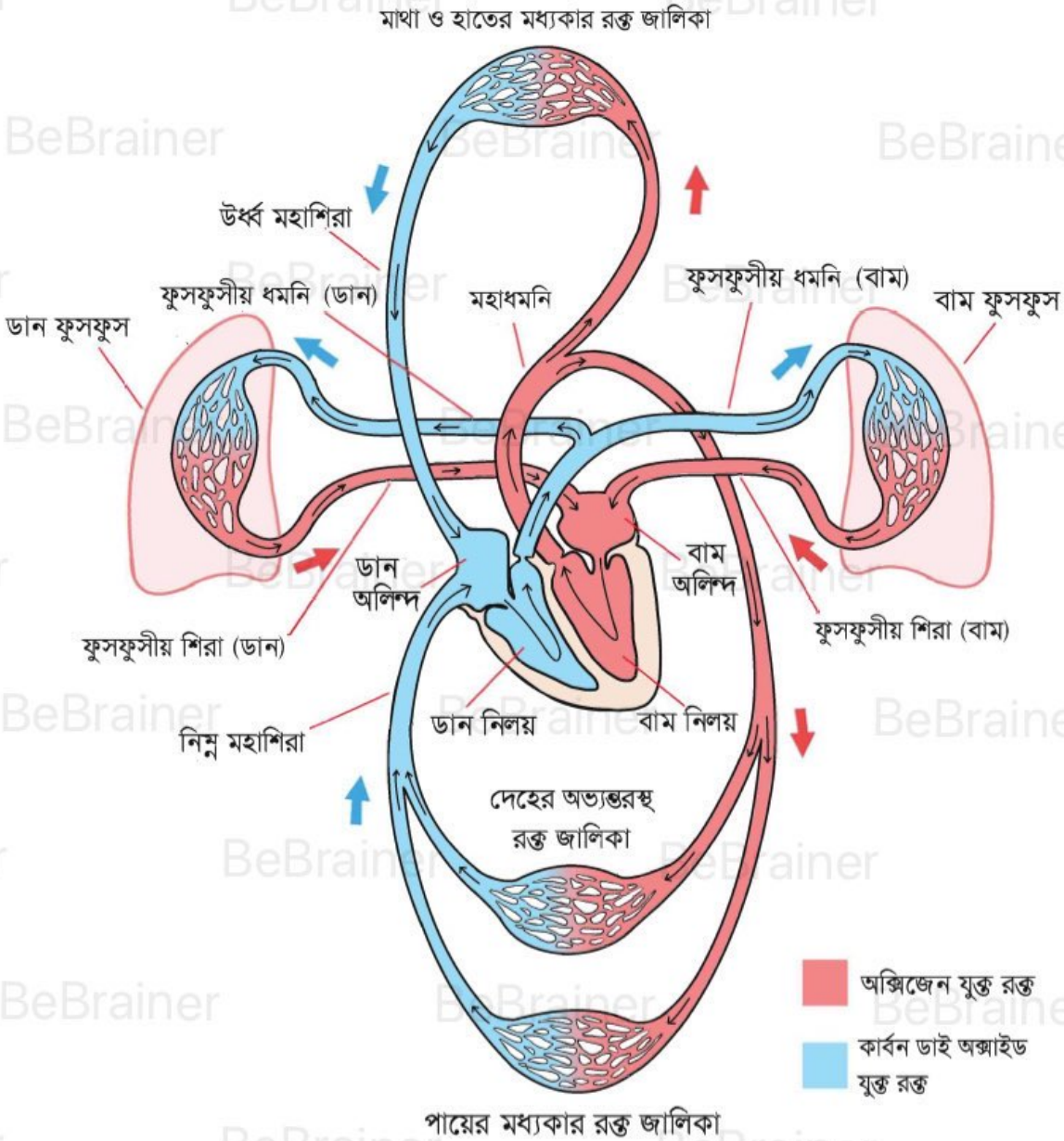
আমরা পূর্বে জেনেছি, মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা এবং কৈশিক জালিকা নিয়ে গঠিত। মানুষের হৃৎপিণ্ড অবিরাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে ধমনি ও শিরার মাধ্যমে রক্ত সংবহন করে। হৃৎপিণ্ড পাম্পের মতো নির্দিষ্ট তালে ও ছন্দে সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায় (চিত্র ৩.১১)।

হৃৎপিণ্ডের স্বতঃস্ফূর্ত সংকোচনকে সিস্টোল (systole) এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণকে ডায়াস্টোল (diastole) বলে। উল্লেখ্য, অলিন্দে যখন সিস্টোল হয়, নিলয় তখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে।

মানবদেহের রক্ত সংবহন ৩.১২ চিত্রে দেখানো হয়েছে।

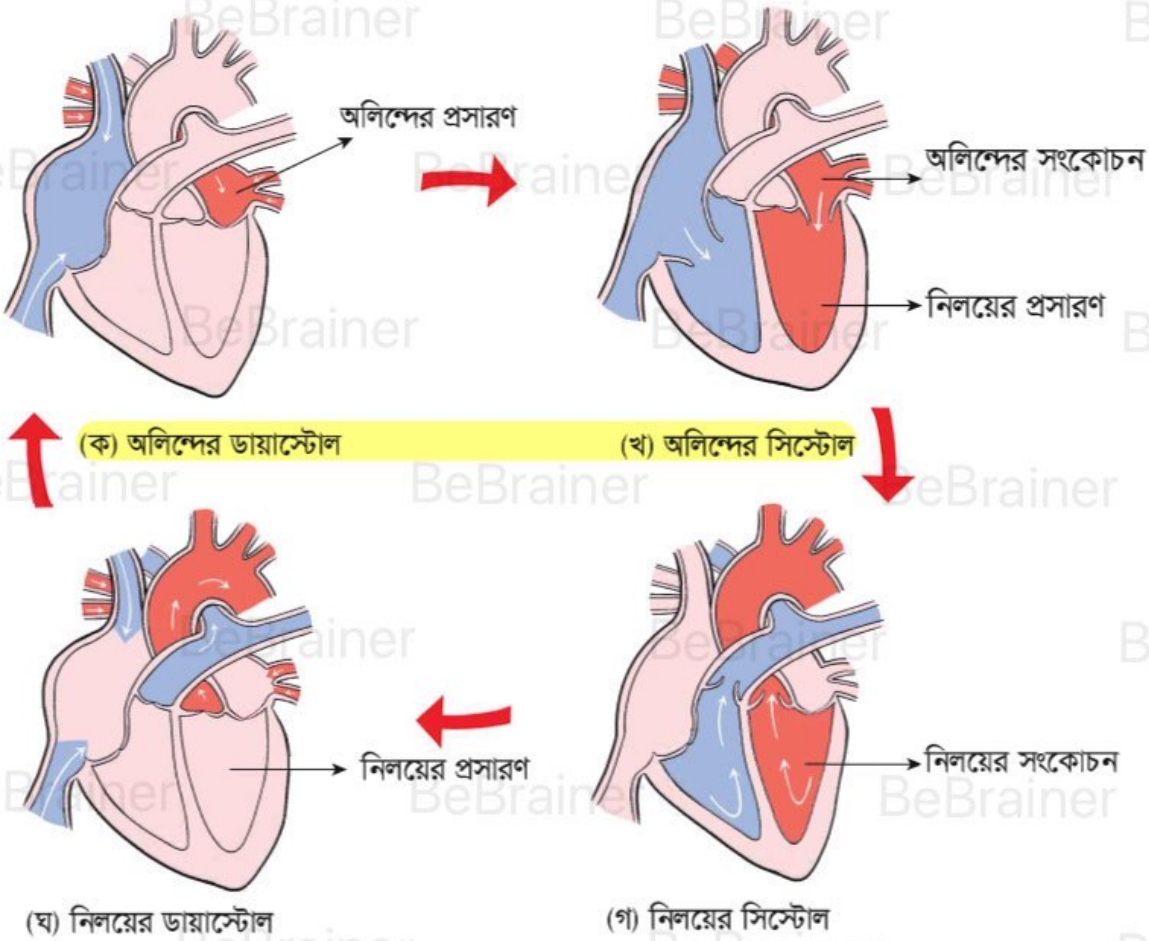
হার্ট-বিট

আমরা আগেই বলেছি, হৃৎপিণ্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মতো দেহের ভিতরে সারাক্ষণ ছন্দের তালে স্পন্দিত হয়। হৃৎপিণ্ডের এই স্পন্দনকে হৃৎস্পন্দন বা হার্ট-বিট বলে। এই হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহিত করে।



চিত্র ৩.১২: মানবদেহের রক্ত সংবহন

হার্ট-বিট বা হৃৎস্পন্দন একটি জটিল বিষয়। মানুষের হৃৎপিণ্ড মায়োজনিক (myogenic) অর্থাৎ বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়া হৃদপেশি নিজে থেকে সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি করে। একটি হৃৎস্পন্দন হৃৎপিণ্ডে পর পর সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে কার্ডিয়াক চক্র বলে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভেতর গতিশীল থাকে। কার্ডিয়াক চক্র চারটি ধাপে (চিত্র ৩.১৩: ক, খ, গ, এবং ঘ) সম্পন্ন হয়:



চিত্র ৩.১৩: কার্ডিয়াক চক্র

(ক) অলিন্দের ডায়াস্টোল: এ সময় অলিন্দ দুটি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। ফলে সারা শরীরের CO_2 যুক্ত রক্ত ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন মহাশিরা দিয়ে ডান অলিন্দে এবং ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে।

(খ) অলিন্দের সিস্টোল: অলিন্দ দুটি রক্তপূর্ণ হলে এ দুটি সংকুচিত হয়। ডান অলিন্দ থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ডান নিলয় এবং বাম অলিন্দ থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে আসে।

(গ) নিলয়ের সিস্টোল: নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়। এ সময় ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ থাকে এবং সেমিলুনার কপাটিকা খোলা থাকে। নিলয়ের সিস্টোলের সময় কপাটিকাগুলো বন্ধের সময় হৃৎস্পন্দনের প্রথম যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে 'লাব' বলে।

এ সময় বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত (O_2 যুক্ত রক্ত) মহাধমনি এবং ডান নিলয় থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনিতে প্রবেশ করে। মহাধমনি থেকে রক্ত বিভিন্ন ধমনি ও শাখা দিয়ে দেহস্থ

বিভিন্ন জালকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কলাকোষকে পুষ্টিদ্রব্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। অপরপক্ষে ফুসফুসীয় ধমনি থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় জালকে প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে আসে। অপরপক্ষে সারা দেহস্থ রক্ত জালক থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড-যুক্ত রক্ত (দূষিত রক্ত) উপশিরা, শিরা ও মহাশিরা দিয়ে পুনরায় অলিন্দে ফিরে আসে।

(ঘ) নিলয়ের ডায়াস্টোল: নিলয়ে সিস্টোলের পর পরই নিলয়ের ডায়াস্টোল শুরু হয়। এই সময় আবার অলিন্দ থেকে রক্ত এসে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিলয় পূর্ণ হতে থাকে। এই সময় এখানকার সেমিলুনার ভালভ বন্ধের সময় যে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে 'ডাব' বলে।

সুতরাং হৃৎপিণ্ডের শব্দগুলো হলো:

নিলয়ের সিস্টোল = লাব
নিলয়ের ডায়াস্টোল = ডাব



চিত্র ৩.১৪: নাড়ি বা পালস দেখা

একটি সিস্টোল ও একটি ডায়াস্টোলের সমন্বয়ে একটি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন হয় এবং সময় লাগে প্রায় ০.৮ সেকেন্ড। একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ বার হয়। এটাকে হার্ট-বিট বলা হয়। আমাদের হাতের কবজির রেডিয়াল ধমনিতে এই স্পন্দন গোনা যায় আবার বুকের বাম দিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে শব্দ শোনা যায়। হাতের কবজিতে হৃৎস্পন্দন অনুভব করাকে পালস বলে। স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃৎস্পন্দনের যে শব্দ শোনা যায়, তাকে হার্টসাউন্ড বলে। হৃৎস্পন্দন বা হার্ট-বিটকে যখন প্রতি মিনিটে হাতের কবজিতে গণনা করা হয়, তখন তাকে পালস রেট বলে।

৩.৩.৩ হার্ট-বিট বা পালসরেট গণনার পদ্ধতি

রোগীর হাতের কবজিতে হাতের তিন আঙুল যেমন: অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনি দিয়ে চাপ দিলে হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে কতবার হয় তা অনুভব করা যায়। হাতের তিন আঙুল এমনভাবে রাখতে হবে যেন তর্জনি থাকে হৃৎপিণ্ডের দিকে, মধ্যমা মাঝখানে এবং অনামিকা হাতের আঙুলের দিকে (চিত্র ৩.১৪)। মধ্যমা আঙুল দিয়ে বোঝা যাবে হাতের রেডিয়াল ধমনি কত বার ধুকধুক করছে। এক মিনিটে কতোবার স্পন্দিত হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে পালস রেট বা পালসের গতি। পালসকে আমরা সাধারণভাবে নাড়ি বলে থাকি।

কবজিতে পালস না পাওয়া গেলে কণ্ঠনালির পাশে হৃৎস্পন্দন দেখা যেতে পারে অথবা সরাসরি বুকে

কান পেতেও হার্ট সাউন্ড শোনার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেকোনো সাধারণ মানুষের পালসের গতি প্রতি মিনিটে কতবার হচ্ছে তা দেখা যায় উপরের বর্ণনা অনুসারে ব্যবস্থা নিলে। ঘড়ি ধরে পালসের গতি দেখতে হয়। সাধারণত পালসের গতি দ্রুত হয় পরিশ্রম করলে, ঘাবড়ে গেলে, ভয় পেলে, তীব্র যন্ত্রণা হলে কিংবা জ্বর হলে। পালসের স্বাভাবিক গতি হলো প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ বার। শিশুদের জন্য এটি বেশি প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১৪০ বার। পূর্ণবয়স্ক মানুষের পালস রেট প্রতি মিনিটে ১০০-এর অধিক হয় জ্বর ও শক্ (অচেতনতা) অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির অতি কার্যকারিতার কারণে। ১° ফারেনহাইট তাপ বৃদ্ধির জন্য পালসের গতি প্রতি মিনিটে ১০ বার করে বাড়ে। পালসের গতি খুব দ্রুত, খুব মন্থর বা অনিয়ন্ত্রিত হলে বুঝতে হবে যে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা আছে। প্রতি মিনিটে পালসের গতি ৬০-এর কম হতে পারে হার্ট ব্লকের বা জন্ডিসের কারণে।

স্বাভাবিকভাবে মানসিক উত্তেজনা, ব্যায়াম, সন্ধ্যার দিকে পালসের গতি বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পালসের গতি অধিক হলেও তা স্বাভাবিক ভাবতে হবে। ঘুমানো অবস্থায় এবং রাতে সুনিদ্রার পর সকালে পালসের গতি ৬০-এর কম হতে পারে। এ অবস্থাটিকেও স্বাভাবিক ধরতে হবে।

৩.৪ রক্ত চাপ

হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ধমনিপ্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয়, সেটাকে রক্তচাপ বলে। তাই রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির রক্তচাপকেই বুঝায়। রক্তচাপ হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা, ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা এবং রক্তের ঘনত্ব এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে। নিলয়ের সিস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে, তাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ এবং ডায়াস্টোল অবস্থায় যে চাপ থাকে, তাকে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলে। স্বাভাবিক এবং সুস্থ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ১১০ - ১৪০ মিলিমিটার (mm Hg) এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ৬০-৯০ মিলিমিটার (mm Hg)। স্বাভাবিক রক্তচাপকে ১২০/৮০ (mm Hg) এভাবে প্রকাশ করা হয়। স্ফিগমোম্যানোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।

৩.৪.১ উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপকে ডাক্তারি ভাষায় হাইপারটেনশন বলে। শরীর আর মনের স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তচাপ যদি বয়সের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপরে অবস্থান করতে থাকে, তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। রক্তের চাপ যদি কম থাকে তা হলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বলে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন আর প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনি গায়ে কোনো ব্যক্তির সিস্টোলিক রক্তচাপ যদি সব সময় ১৬০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ বা তার বেশি এবং ডায়াস্টোলিক সব সময় ৯৫ মিলিমিটার

পারদস্তম্ভ বা তার বেশি থাকে, তবে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে বলা যায়। উত্তেজনা, চিন্তা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রক্তচাপ সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে, তবে তাকে হাইপারটেনশন বলা যাবে না এবং তার জন্য বিশেষ কোনো ঔষধেরও প্রয়োজন হয় না।

হাইপারটেনশন হাওয়ার প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। তবে অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, মেদবহুল শরীর, অতিরিক্ত লবণ খাওয়া, অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, ডায়াবেটিস, অস্থিরচিত্ত এবং মানসিক চাপগ্রস্ত, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য— এরকম ব্যক্তিদের মাঝে এ রোগের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। হাইপারটেনশন রোগীদের যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক এবং ফেইলিউর, কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত প্রভৃতি। নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মতো এত মারাত্মক নয়। তবে রক্তচাপ যথেষ্ট কমে গেলে নানা রকম অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।

রক্তচাপ প্রতিরোধ করার জন্য কিংবা প্রতিকার হিসেবে নিচের সতর্কতামূলক নিয়মগুলো পালন করলে উপকার পাওয়া যায়:

১. ডায়াবেটিস থাকলে সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখা।
২. দেহের ওজন না বাড়ানো।
৩. চর্বিযুক্ত খাদ্য বর্জন করা। (যেমন: ঘি, মাখন, গরু ও খাসির মাংস, চিংড়ি ইত্যাদি)
৪. সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
৫. পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৬. ধূমপান থেকে বিরত থাকা।
৭. নিয়মিত ব্যায়াম করা।
৮. দৈনিক ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমানো।
৯. মানসিক চাপমুক্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা।
১০. খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

৩.৪.২ কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল এক বিশেষ ধরনের জটিল স্নেহ পদার্থ বা লিপিড এবং স্টেরয়েড-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানুষের প্রায় প্রত্যেক কোষ ও টিস্যুতে কোলেস্টেরল থাকে। যকৃৎ এবং মগজে এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। কোলেস্টেরল অন্যান্য স্নেহ পদার্থের সাথে মিশে রক্তে স্নেহের বাহক হিসেবে কাজ করে। স্নেহ এবং প্রোটিনের যৌগকে লাইপোপ্রোটিন বলে। স্নেহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে লাইপোপ্রোটিন দুই রকম— উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (High Density Lipoprotein—HDL) এবং নিম্ন ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (Low Density Lipoprotein— LDL)। রক্তের LDL-এর পরিমাণের

বৃদ্ধির সাথে কোলেস্টেরলের আধিক্যের সম্পর্ক আছে। রক্তে LDL-এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। রক্তে HDL-এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য উপকারী। রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক পরিমাণ ১০০ - ২০০ mg/dl। রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য হৃদ্‌রোগের আশঙ্কা বাড়ায়। স্বাভাবিক মাত্রা থেকে রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে রক্তনালি অন্তঃপ্রাচীরের গায়ে কোলেস্টেরল ও ক্যালসিয়াম জমা হয়ে রক্তনালি গহ্বর ছোট হয়ে যায়। এ কারণে ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থাকে ধমনির কাঠিন্য বা arteriosclerosis বলে। আর্টারিওস্কেলরোসিসের কারণে ধমনির প্রাচীরে ফাটল দেখা দিতে পারে। ধমনির গায়ে ফাটল দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ডের করোনারি রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে করোনারি থ্রম্বোসিস বলে এবং মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বলে। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে। রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে LDL-এর পরিমাণ বেড়ে যায় আর HDL-এর পরিমাণ কমে যায়। LDL-এর পরিমাণ ১৫০ mg/d থেকে বেশি হলে তাকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

৩.৫ হৃদ্‌যন্ত্রকে ভালো রাখার উপায়

আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে জেনেছি, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন সুষম খাদ্য এবং শরীরকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন ব্যায়াম ও বিশ্রাম। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা যেমন আবশ্যক, তেমনি খাদ্য গ্রহণ এবং জীবনপ্রণালি সম্বন্ধে কতগুলো সুঅভ্যাস গড়ে তোলাও একান্ত আবশ্যক। অনেক কারণেই দেহে নানা ধরনের রোগ হতে পারে। তবে সঠিক খাদ্যব্যবস্থা এবং জীবনপ্রণালি অনুসরণ করে হৃদ্‌যন্ত্রকে ঠিক রাখা যায়। সেগুলো হচ্ছে:

১. দেহের উচ্চতা এবং বয়স অনুসারে কাঙ্ক্ষিত ওজন বজায় রাখা আবশ্যক। দেহের ওজন বেশি হলে হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন মিশ্রিত খাবার খাওয়া উচিত।

৩. শর্করা, মিষ্টি ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শাক-সবজি ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। উদ্ভিজ তেল গ্রহণ করা উচিত, তবে সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায় এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা হ্রাস করে। মাছভোজীদের হৃদ্‌রোগের প্রকোপ এ জন্য তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

৪. সুষম খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা যা আছে তা অপরিবর্তিত রাখা উচিত। তবে খাওয়ার লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। রসুন, তেঁতুল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল ও অন্যান্য ফল নিয়মিত খেলে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম থাকে।

এগুলো ছাড়া সঠিক ও পরিমিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ এবং অতিভোজন হতে বিরত থাকতে হবে। অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি এড়ানো, নিয়মিত হালকা ব্যায়াম অথবা হাঁটা এবং সুষ্ঠু জীবনযাপন অর্থাৎ সময়মতো ঘুমানো, ধূমাপান থেকে বিরত থাকলে হৃদ্‌রোগ বা উচ্চরক্ত চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩.৬ ডায়াবেটিস, বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগ

ডায়াবেটিস এক ধরনের বিপাকজনিত রোগ।

আমরা যখন কিছু খাই, এটি গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তের মাঝে আসে। প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন নামে এক ধরনের হরমোন নির্গত হয়, যেটি রক্তের এই গ্লুকোজকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কারো ডায়াবেটিস হলে প্যানক্রিয়াস যথেষ্ট ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না কিংবা শরীর ইনসুলিনকে ব্যবহার করতে পারে না। যে কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মানুষের রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ৪.০-৬.০ mMole\l কিংবা (৭০-১১০ মি.গ্রা/ডেসি.লি.)। ডায়াবেটিস হলে রক্তে এর পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ীভাবে অনেক বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়। ডায়াবেটিস হৃদ্‌যন্ত্রের রক্তপ্রবাহ রোগের ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের, যেমন হৃৎপিণ্ড, কিডনি, চোখ ইত্যাদির স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে ডায়াবেটিস রোগীদের করোনারি হৃদ্‌রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। এটি হৃৎপিণ্ডকে অচল করে দেয় এবং রোগী স্ট্রোক হয়ে মারা যেতে পারে। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস রোগে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং এর থেকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন হয়। উচ্চ রক্তচাপ করোনারি হৃদ্‌রোগের পূর্বলক্ষণ। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকলে তাদের করোনারি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি থাকে।

কোন ব্যক্তির ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি

যে কেউ যেকোনো সময়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে, তবে চার শ্রেণির মানুষের ডায়াবেটিস বেশি হয়ে থাকে:

১. যাদের বংশে, যেমন: মা-বাবা সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে।
২. যাদের ওজন বেশি এবং শরীর মেদবহুল।
৩. যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করে না।
৪. দীর্ঘদিন যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করে।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ

১. ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বিশেষ করে রাতে ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া।

২. খুব বেশি পিপাসা লাগা।
৩. বেশি ক্ষুধা লাগা এবং অতিমাত্রায় শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করা।
৪. যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া এবং শীর্ণতা।
৫. সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করা।
৬. চামড়া শুকিয়ে যাওয়া।
৭. চোখে ঝাপসা দেখা।
৮. শরীরের কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে, দেরিতে শুকানো।

ডায়াবেটিস রোগীর পথ্য

ডায়াবেটিস রোগকে দমিয়ে রাখতে খাদ্যের ভূমিকা অসামান্য। ডায়াবেটিস রোগের জন্য ওষুধ সেবন করলেও রোগীকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নিয়ন্ত্রিত খাদ্যব্যবস্থা না থাকলে ওষুধ সেবন করেও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। রোগীকে এমন খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে, যা তার ন্যূনতম ক্যালরির চাহিদা পূরণ করবে কিন্তু এই খাদ্যের দ্বারা রক্তে ও প্রস্রাবে যাতে শর্করা বেড়ে না যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

ডায়াবেটিস প্রধানত তিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যথা: খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ওষুধ সেবন এবং জীবন-শৃঙ্খলা।

(ক) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ: মোটা লোকদের ডায়াবেটিস হলে তাদের ওজন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। ডায়াবেটিস রোগীদের একটুও চিনি বা মিষ্টি খাওয়া চলবে না। তাদের এমন খাবার খাওয়া উচিত, যা প্রোটিনসমৃদ্ধ (গাঢ় সবুজ রঙের শাক-সবজি, বরবটি, মাশরুম, বাদাম, ডিম, মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস ইত্যাদি) এবং যেখানে শ্বেতসার কম থাকে।

(খ) ওষুধ সেবন: সব ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক রোগীদের এ দুটি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করলে রোগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। কিন্তু ইনসুলিননির্ভর রোগীদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনের দরকার হয়।

(গ) জীবন শৃঙ্খলা: শৃঙ্খলা ডায়াবেটিস রোগীর জীবন-কাঠি। তাকে এসব বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে:

১. নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুষম খাবার খেতে হবে।
২. নিয়মিত ও পরিমাণমতো ব্যায়াম করতে হবে।
৩. নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
৪. মিষ্টি খাওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রক্ত জমাট বাঁধানো কোনটির কাজ?

(ক) লোহিত কণিকা (খ) অণুচক্রিকা
(গ) শ্বেত কণিকা ঘ) লসিকা কোষ

২. অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে—

(ক) ধমনি ও পালমোনারি ধমনি (খ) শিরা ও পালমোনারি শিরা
(গ) ধমনি ও পালমোনারি শিরা (ঘ) শিরা ও ধমনি

নিচের অনুচ্ছদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অভিষেক ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে তার বন্ধুর মারাত্মক রক্তক্ষরণ হয়। ফলে রক্তের প্রয়োজন। বন্ধুর রক্ত পরীক্ষা ছাড়াই অভিষেক বলল, আমি রক্ত দিতে পারব।

৩. অভিষেকের রক্তের গ্রুপ কী ছিল?

(ক) A (খ) B
(গ) AB (ঘ) O

৪. রক্তরসে কোন গ্যাসীয় পদার্থ নেই?

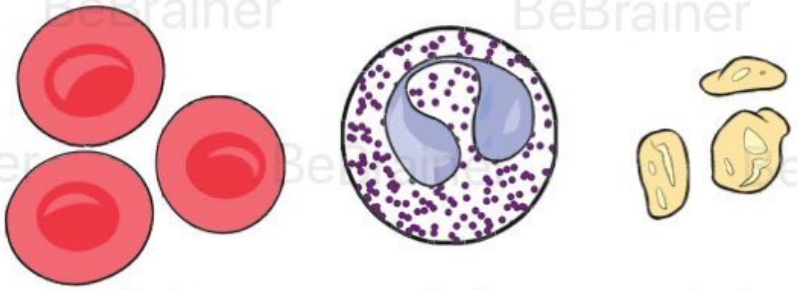
(ক) O_2 (খ) CO_2
(গ) Cl_2 (ঘ) N_2

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাফিন ১০ম শ্রেণির ছাত্র। তার আব্বা সুঠাম দেহের অধিকারী। রাফিন লক্ষ করছে, তার আব্বার দেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে শুকাতে দেরি হচ্ছে, চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে, সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ছেন। এসব কারণে রাফিনের আব্বা ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সুস্থ থাকার জন্য কিছু নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার উপদেশ দিলেন।

(ক) রক্তচাপ কাকে বলে?
(খ) সিস্টোলিক রক্তচাপ বলতে কী বোঝায়?
(গ) রাফিনের আব্বা কী রোগে আক্রান্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) ডাক্তার সাহেব রাফিনের আব্বাকে সুস্থ থাকার জন্য কী উপদেশ দেন? ব্যাখ্যা কর।

২. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



চিত্র-A চিত্র-B চিত্র-C

(ক) রক্ত কাকে বলে?
(খ) কৈশিক জালিকা বলতে কী বুঝায়?
(গ) মানবদেহে চিত্রের B চিহ্নিত কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) "চিত্রের A ও C একই যোজক কলায় অবস্থিত হলেও এদের কাজ ভিন্ন"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।